চাঁদপুরের পথে-প্রান্তরে

চারণ কবির পদচিহ্ন লোকালয়ে অবিরাম

(চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার মহাপ্রয়াণের দ্বিতীয় বর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ)

প্রকৌঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন

অজপাড়া গাঁ থেকে উঠে আসা একজন সংবাদকর্মী পত্রিকার হেডিং লিখেছেন, 'কাজী জাফর সফলকাম আশি টাকা চিনির দাম।' দারুণ হৈ চৈ চারদিকে। কে এই সংবাদকর্মী? বাংলাদেশের একজন মন্ত্রীর নাম নিয়ে সরাসরি এভাবে লিখতে পারে। খোঁজ পড়ল লেখকের, দেখা গেল তিনি একজন চারণ কবি। জীবন যৌবনের সবটুকু অংশ ব্যয় করেছেন সাহিত্যের জন্যে, মানুষের জন্যে। অনেক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও নিজের গ্রাম ফুলছোঁয়াকে ভালোবেসে গাঁয়েই রয়ে গেছেন। রাতে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে গ্রামের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার জন্যে নিরলস পরিশ্রম করেছেন। লাল কোর্তা বাহিনী গঠন করে চাষীদের একত্রিত করার চেষ্টা করছেন। তিনি সামছুল হক মোল্লা। পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র সন্তান। সমর্থবান, স্বচ্ছল কৃষক পরিবারের সন্তান, এক কথায় বলা যায়- ছোটখাট জোতজমার মালিক। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভুঁইসম্পত্তি বিক্রয় করে সমাজসেবায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তিনি। আগামী ৪ মার্চ, ২০১০ তাঁর ২য় মৃত্যুবার্ষিকী।

আমার ছেলেবেলায় আমি যখন চাঁদপুর কলেজে পড়তাম। সকালে কলেজে যাবার সময় অথবা বিকেলে ফেরার সময় বাকিলা বাজারে সামছুল হক মোল্লার দোকানে আমার যাত্রাবিরতি ঘটতো। কথা হতো তাঁর সাথে। সকল কথাই সমাজ বিবর্তনের। সামছুল হক মোল্লা আমাকে বলেছিলেন, নামাজের কাতারে সাম্য থাকলে ভাতের প্লেটেও সাম্য চাই। মানুষে মানুষে কোনো প্রভেদ নেই। এ কথাটি আমাদের বুঝতে হবে। তিনি প্রায়ই মাও সেতুং থেকে উদ্ধৃতি দিতেন, 'এ পৃথিবী তোমাদের ও আমাদের। অবশেষে তোমাদেরই। তোমরা সকালবেলার ৮-৯ টার সূর্যের মতো। তোমাদের ওপরই আশা রাখি।' তরুণদের আহ্বান জানাতেন দেশের সমাজ বিপ্লবের জন্যে। সমাজ বদলের জন্যে নিজের জমি বিক্রির টাকায় স্বরচিত কবিতা-গান

ছাপাতেন। বইগুলো বিক্রি হতো না। তিনি বিনামুল্যেই বিলোতেন। যদিও আমি জানি, সে সময় তাঁর আর্থিক টানাটানি সংসারে টানাপোড়েনের সৃষ্টি করেছিলো। অদম্য ছিলেন সামছুল হক মোল্লা। মানুষের মুক্তির জন্যে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে অসীম সাহসী ছিলেন তিনি। ছোটবেলায়ই আমার স্মৃতিতে ধারণ করা অনেক নায়কের একজন মনে হতো তাঁকে। তিনি চলে গেছেন।

আজ মনে পড়ে এই তো সেদিন মাত্র তিন বছরেরও কম সময় আগে আমি গিয়েছিলাম ফুলছোঁয়া গ্রামে। শ্রদ্ধেয় চারণ কবিকে মনভরে দেখতে। শুনতে তার কথাগুলো যা একদিন স্মৃতি হয়ে থাকবে। সত্যিই সেদিনের কথাগুলো আজ স্মৃতি। ফুলছোঁয়া থেকে ফিরে আমি লিখেছিলাম, "পাঁচিশ আষাঢ় চৌদ্দ'শ তের বঙ্গাব্দ। সারারাত আকাশ ভেঙ্গে দুর্দান্ত বর্ষা তার দানবীয় শক্তির মদমত্তা নিয়ে, অবিরাম ধারায় ঝরেছে। আমি শংঙ্কিত ছিলাম ভোরে সুর্যের মুখ দেখব কি-না? যদি বৃষ্টি তার বর্ষণ না থামায়, আমরা কেমন করে ঘরের বাহির হবো? রাতে যখন ঘুমাতে যাই, তখন বাতাসের শরীর ভারী ছিলো পানিতে। আবহাওয়া ছিলো দারুণ গুমোট অস্বস্তিকর, অসহ্য ভ্যাপসা গরম সত্ত্বেও তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম। ভোরেই ফুলছোঁয়া যেতে হবে। মাঝরাত থেকেই শুরু হলো ভারী বর্ষণ। অঝোরধারায় বারিপাত, ভোররাতে হিম হিম শীতের একটা আমেজ সৃষ্টি হলো। দারুণ উপভোগ্য ও মধুময় ঘুম নামলো দুটো ক্লান্ত চোখে।

তারপরও হৃদয়ের টানে ভোরের আলো ফোটার আগেই ঘুম ভেঙ্গে গেলো। শয্যা থেকে টেলিফোন করি সউদীআরব থেকে প্রকাশিত 'মরুপলাশ' ও 'রুপসী চাঁদপুর' এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি আসিফ ইসলামকে। ওপার থেকে শব্দ আসে, 'আমি তৈরি'। আমাদের অবাক করে যাত্রা শুরুর লগ্নে বৃষ্টি তার বর্ষণ সম্পুর্ণ বন্ধ করে দেয়। ভাবলাম হয়তো প্রকৃতি আজ তেমন বৈরী হবে না। আমরা দু'জন খুব ভোরেই যাত্রা করি চাঁদপুর শহর থেকে ১৭ কিলোমিটার দুর গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। আমাদের সাথী একটি ডিজিটাল ক্যামেরা। সুদুর সৌদী আরব থেকে ইন্টারনেটভিত্তিক ওয়েভ সাইট 'রুপসী চাঁদপুর' ও 'মরুপলাশ' এর সম্পাদক দেওয়ান আবদুল বাসেত, আষাঢ়ের শুরুতে আমাদের অনুরোধ করেছিলেন, চারণ কবি মুকুন্দদাশের পর, বাংলার সবচাইতে শ্রেষ্ঠ চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও কিছু ছবি সংগ্রহ করে তার ওয়েব সাইটে পোঁছে দিতে।" আজ এই কথাগুলো শুধুই স্মৃতি। তিনি চলে গেছেন, কিন্তু আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। এই তো তিনি আমার সম্মুখেই আছেন। শুনতে পাচ্ছি তাঁর কথা। শেষ দিনগুলোতে দারুণ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন এই মানুষটি শরীরে ও স্মৃতিতে। অনেক কথা স্মরণ করতে

পারছেন না সামছুল হক মোল্লা। খেই হারিয়ে ফেলতেন। আমরা সূত্র ধরে দিলে ত্যাজোদীপ্ত হয়ে ওঠতেন এই চারণ কবি, অনর্গল বলে যেতেন হারানো দিনের কথা।

সেদিন দেওয়ান আবদুল বাসেতের অনুরোধের পর পরই দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠের প্রধান সম্পাদক, চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার অপরিমেয় স্নেহভাজন ব্যক্তিত্ব কাজী শাহাদাত কবির ছয়টি প্রকাশিত বই- ১) জওয়াব দাও বাংলদেশ, ২) দেশের মালিক কান্দে, ৩) ফরিয়াদ, ৪) ভুলব না, ৫) গরীবের কথা, ৬) সময়ের ডাক আমার হাতে তুলে দিয়ে, কবি তীর্থ ফুলছোঁয়া যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। দুটো অনুরোধের সাথে আমার নিজেরও একটি তাড়া ছিলো। বহুদিন থেকে অন্তরে একটা তাগিদ অনুভব করেছিলাম একবার তাঁকে দেখি। দর্শন আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিলো চিত্তে।

উনসত্তরের দুর্বার গণআন্দোলনে তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তানের শহর, বন্দর, গ্রামগঞ্জ দারুণ উত্তপ্ত। দারুণ ব্যস্ত সামছুল হক মোল্লা। গ্রামে গ্রামে গড়ে তুলেছেন লাল কোর্তা বাহিনী। তারপর এলো মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ একাত্তর। চারদিকে বারুদের গন্ধ আর স্বজনের লাশ। চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার সাথে তখন আমার পরিচয়ের নিবিড়তা বেড়েছে। একসাথে পাঠান বাহিনীর সক্রিয় যোদ্ধা হিসেবে রণাঙ্গানে লড়েছি আমরা। কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত চাঁদপুর মহকুমার ফুলছোঁয়া গ্রামে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ আর সহজ-সরল জীবনধারার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ডাকাতিয়া নদীর শাখা খাল। গাছ-গাছালির ছায়ায় পাখির কলতানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গান গাইতে গাইতে স্কুলের পথ ধরে চলেছে একটি বালক, পরনে সাদা ধুতি ও ফতুয়া, পার্শ্ববতী স্বর্ণা গ্রামের জমিদার রাজেন্দ্র বাবু বাকিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মেধাবী এই বালকটিকে খুবই স্নেহ করেন।

বালকটির সৎ সাহস ও পরোপকার তাকে সকলের প্রিয় করে তুলেছে। এই বালকই কালক্রমে বাংলা ভাষার লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রবাদ পুরুষ, চারণ কবি সামছুল হক মোল্লা হিসেবে নিজেকে খ্যাতিমান করে তুলেছেন। সাহিত্যাঙ্গনে রেখেছেন অমোছনীয় একটি ছাপ। তাঁর দৃপ্ত পদচিহ্ন আজও খুঁজে পাওয়া যায় বাংলার এ অঞ্চলের পথে-প্রান্তরে। পৃথিবীর বিশাল অঙ্গনে কত মানুষের সাথেই তো কত মানুষের জানাশোনা হয় কিন্তু ক'জনের কথাই বা ক'জন মনে রাখে। তবুও একজাতের মানুষ বিশাল পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় যাদের একবার দেখলে ভোলা যায় না। সামছুল হক মোল্লা তেমনিই একজন মানুষ। নিজ গুণে তিনি চিরঞ্জীব থাকবেন অনাদি-অনন্তকাল। আর এখানেই মানবজন্মের সার্থকতা। ১৯৬৯, '৭০, '৭১ সনের সংগ্রামী, সাহসী মানুষটি আজ আর আমাদের মাঝে নেই।

ফুলছোঁয়াতে কবির বাড়ির আঙ্গিনায় কবির সঙ্গে মরুপলাশ প্রতিনিধি আসিফ ইসলাম এবং লেখক প্রকৌ: দেলোয়ার হোসেইন।

মনে পড়ে এই তো সেদিনে কথা। আমি প্রথম এসেছি চারণ কবির বাড়িতে। ফুলছোঁয়া মোল্লা বাড়িটি ইসলামী আবহাওয়ায় লালিত। ঢোকার পথেই একটি পাকা মসজিদ। তার পরপরই কাচারি ঘর। রিক্শা থেকে নামতেই স্থানীয় কিছু লোক আমাদের ঘিরে ধরলো। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এই বাড়ির? তিনি খুবই স্পষ্ট এবং গর্বিত কণ্ঠে বললেন,

চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার বড় ছেলে আমি। ক্ষণকাল পরে একটি চৌচালা টিনের ঘরে পৌঁছে গেলাম আমরা। প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতার একজন সৌম্যকান্তি পুরুষের সাথে দেখা হলো বাড়ির উঠোনে। মেপে চলেন, মেপে কথা বলেন, কিন্তু সদালাপী। আলাপে বিনয়ী, চলনে মার্জিত, চোখা চোখা কথা। তার অনুরোধে বসার ঘরে গিয়ে বসলাম। আলাপের শুরুতেই টের পাওয়া যায়, কথায় ও কাজে সুরুচির অপূর্ব সম্ভার। শিল্প-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সারা জীবনটা একবার প্রদক্ষিণ করে এলেন। স্মৃতিচারণ করলেন, নস্টালজিক হলেন। নিজের শিল্পী জীবন, কর্ম, সে সাথে আপন সময়টিকে একের পর এক কথার মালা দিয়ে সাজিয়ে তুললেন তিনি। চিন্তা আর কর্মে নিজের কাছেই জেদী কবি। হার না মানার প্রত্যয় সেই জেদের। কবিতার অবয়বে সৃষ্ট চোখে পৃথিবীকে দেখার আনন্দ তাঁর বুকের নিঃশ্বাসে। কবির জন্ম ১৯২৩ সালে হাজীগঞ্জ থানার এই ফুলছোঁয়া গ্রামে। তিনি বিদায় নিলেন ২০০৯ সালের, ৪ মার্চ। পৃথিবীতে বছর তিনি বেঁচেছিলেন ছিয়াশিটি বছর। তাঁর সমগ্র কর্মজীবন ব্যপৃত ছিলো মানুষের মুক্তির চিন্তায়। কর্মে ও ধ্যানে তিনি বিশ্বাস করতেন, মানব ধর্মই জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। মানুষের সেবা-ই শ্রেষ্ঠ কর্ম। সুপ্রিয় পাঠক, আবারও ফিরে আসি তাঁর সাথে সাক্ষাতের সময়টিতে।

আলোচনা থেকে আমরা অনুভব করলাম, অভিজ্ঞতা তাঁর সীমাহীন। তাঁর সময়ের ঘটনাবহুল অনেক ভালো-মন্দ প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞজন তিনি। গোটা বাংলার শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতির উত্তরণের উজ্জ্বল অধ্যায়গুলোকে তিনি যেমন দেখেছেন, তেমনি পর্যবেক্ষণ করেছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আর তার ভয়ঙ্কর দুঃসময়কে। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে মানুষের দুর্গতি দেখেছেন তিনি। কখনও সাথী হয়েছেন দুর্ভিক্ষের। প্রত্যক্ষ করেছেন দেশভাগ আর সেই সময়ের ঔপনিবেশিক শাসকচক্রের রাজনীতিসৃষ্ট মানুষের নিকৃষ্টতম সাম্প্রদায়িক ক্রোধকে। নিজ জন্মভুমি ভাগের বেদনাকে উপলব্ধি করার অভিজ্ঞতা যেমন তাঁকে ধারণ করতে হয়েছে, তেমনি বাংলাদেশকে আপন করে পাবার ও দু'দুটি ঔপনিবেশিক শাসনের কুটিলতায় জীবনের সিংহভাগকে অতিক্রম করতে হয়েছে তাকে। উনিশ শ' উনসত্তর-এর গণঅভ্যুত্থানে উনিশ শ' একাত্তরের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের তিনি এক প্রত্যক্ষ সৈনিক।

সারাজীবন মানুষের জন্যে কাজ করে গেছেন তিনি। গণসঙ্গীত গেয়ে, কবিতা লিখে বঞ্চিত মানুষকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন এই মহান চারণ কবি। তিনি তার সৃষ্ট ফসল নিয়ে যখন মোড় ফিরেছেন এবং আমূল পাল্টে দিয়েছেন গতানুগতিক ধারণা তখনও কোনো বিলোড়ন হয়নি, বরঞ্চ পাঠক অনুপ্রাণিত হয়েছে। তাঁর সৃষ্ট গণসঙ্গীত সে সময়ের যুব শক্তিকে সাহস জুগিয়েছে। বড় মাপের রুচিমান একজন সৃষ্টিশীল মানুষ কোনো কোনো সময় আড়ালেই থেকে যান। সমকাল তাকে নিয়ে খুব একটা স্পন্দিত হয়তো হয় না, কিন্তু সত্যভাষী মহাকাল তাকে তুলে আনে স্পষ্ট করে তার কৃতকর্মকে। সাহিত্যকর্মে যার রয়েছে অসামান্য জীবন উপলব্ধির নতুন মাত্রা ও গ্রহণ। তিনি কেন এমন প্রচ্ছন্নেই রয়ে গেলেন, সেটাই আমাদের জিজ্ঞাসা। আমরা চাঁদপুরের মানুষেরা আমাদের সন্তানদের গুণের কথা, অর্জনের কথা বলতে হয়তো খানিকটা কার্পণ্যই করি। তাই এতো বড় মাপের এই মানুষটি জীবদ্দশায় পেলেন না তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সংবর্ধনা বা কোনো রাষ্ট্রীয় পদক।

সেদিন তার সহস্রাধিক অপ্রকাশিত কবিতার পাণ্ডুলিপি দেখেছিলাম আধময়লা ধুসর বালিশের মতোই কবির শিয়রে পড়েছিলো পাণ্ডুলিপিটি। কবি মাঝে মধ্যে হাতে নিয়ে দেখছিলেন তাঁর হাজার বিনিদ্র রাতের শ্রমলব্ধ কবিতার ধুসর পাণ্ডুলিপিটি। জেনেছিলাম, আমাদের জাতীয় জীবনের বহু ঘটনা সেখানে বিধৃত হয়ে আছে। অনেক কষ্ট আর শ্রমে রচিত কবিতাগুচ্ছ কোনোদিন ছাপার অক্ষর পাবে কি-না কবি যেমন জানতেন না তেমন আমরাও জানি না । যদি কোনোদিন সুসময় আসে তখন হয়তো পাণ্ডুলিপির খোঁজে কোনো সুধীজন আসবেন এই ফুলছোঁয়া গ্রামে। ততদিন পর্যন্ত ধুসর ধুলোয় ঢাকা পড়ে থাকবে সহস্র বিনিদ্র রজনীর কষ্টসাধ্য শ্রমের ফসল, মুল্যবান কবিতার পাণ্ডুলিপিটি। শেষ জীবনে জীবনযুদ্ধে পরাজিত চারণ কবি শক্তি-সামর্থহীন হয়ে পড়েছিলেন। তাই স্বীয় উদ্যোগে অর্থাভাবে কবিতাগুলোকে ছাপার অক্ষর দিতে পারেননি। কারো কাছে ধর্ণা দেয়ারও মানসিকতা তাঁর ছিলো না। কোনো সুধীজন ইচ্ছে করলে তাঁর সৃষ্টিকে অবয়ব দিতে পারেন।

সামছুল হক মোল্লার জীবন বোধ, স্বভাব এবং আচরণ একজন খাঁটি বাঙালির মতো ছিলো। রুচিশীল সাহিত্যের সাধক, সুস্থ কবিতা-সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক এবং রুচিগ্রাহ্য সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন তিনি। এসবের প্রতি ভালোলাগার পরিধি তার বিস্তৃত ছিলো। প্রকৃত রস-আস্বাদনের জ্ঞান ছিলো প্রসারিত। তাঁর স্মরণশক্তি ছিলো অত্যন্ত প্রখর। ১৯৪৩ সালে তাঁর পিতা কামিজ উদ্দীন মোল্লা মারা যান। পিতার মৃত্যুর দু'বছর পুর্বে অর্থাৎ ১৯৪১ সালে বাকিলা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন তিনি । ১৯৩১ সনে সর্বপ্রথম কবিতা লেখেন, কবি তখন ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। ১৯৪৬ সালে ছাপার অক্ষরে তার প্রথম কবিতা

দৈনিক নবযুগ পত্রিকায় ছাপা হয়। ১৯৪১ সালে কবি চাঁদপুর শাখা ছাত্র ফেডারেশন-এর সভাপতি হন। অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদের সদস্য জুনাব আলী মজুমদারের সাথে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে চারণ কবি সামছুল হক মোল্লা কবিতা আবৃত্তি ও গণসঙ্গীত গাইতেন। আমরা জানি, যে কোনো বড়মাপের সৃজনশীল চারণকবি তার রচনায় সৃষ্টি করেন এক নিজস্ব জগৎ। সেই জগতের নির্মল বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে, পবিত্র জলে অবগাহন সেরে, অনির্বচনীয় সৌন্দর্য উপভোগ করে পাঠক কবি সৃষ্ট জগতের সারসত্য হৃদয়ে ও মননে ধরে বিদগ্ধ পাঠক উত্তীর্ণ হন জ্যোতির্ময় চেতনার স্তরে। অনিত্যতার উর্ধ্বে উঠে পাঠক নিজেকে আবিষ্কার করেন নিত্য সত্যের ভুবনে। স্বাধীনতা পুর্বকালে সামছুল হক মোল্লার বিদগ্ধ ভক্ত ও পাঠক যারা ছিলেন, তারা কবির রচিত কবিতা, গণসঙ্গীত থেকে মুক্তির প্রেরণা লাভ করতেন। কবি তার জীবনে দু'জন নারীর প্রেরণার কথা আমাদের কাছে ব্যক্ত করেন, একজন তার প্রথমা স্ত্রী লজ্জাতুননেছা।

কবির পাশ্ববর্তী গ্রাম মাতৈন সর্দার বাড়ির মেয়ে ছিলেন এই পল্লীবালা লজ্জাতুননেছা। কবির সকল সংগ্রামে তিনি তার সাথী ছিলেন। তার মৃত্যুর পর ১৯৫১ সনে ২৭ বছর বয়সে কবি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। কবি স্ত্রী সামছুন্নাহার বেগম, শ্রীপুর পাটওয়ারী বাড়ির কেরামত আলী পাটওয়ারীর সুন্দরী, বিদুষী কন্যা। দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে তার তিন ছেলে, চার মেয়ে। কবির পরমাত্নীয়ারা সবাই তার সাহিত্যকর্মের ভক্ত, পুজারী। এরাই কবির অন্তরশক্তি। পরমাত্নীয়ের সাহায্য এবং সান্ত্বনা কবিকে আজো প্রাণবন্ত করে রেখেছে। আহত-আপ্লুত হৃদয়, আনন্দ সন্ধানী আত্মা কবিতার কাছ থেকে পেতে চায় সঞ্জীবনী সুধা, প্রকৃতির মতো অব্যর্থ শুশ্রুষা, সহযাত্রীর সহমর্মিতা, অনুভবের স্বীকৃতি, অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য,অশ্রুর উৎস-ছোঁয়ার ঔদার্য, প্রাণের পুলক এবং আরো অনেক কিছু। চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার কবিতার আবেদন উপেক্ষা করার মতো নয়। তাঁর শব্দ-সোনা আমাদের আকৃষ্ট করে। যতই শুনি, কান পেতে শোনার ইচ্ছা তীব্র হয় তত। তাঁর কবিতা পাঠ হৃদয়ে কম্পন ধরায়।

আমরা তাঁর প্রকাশিত কবিতার বই পাঠ করে এই ধারণায় উপনীত হয়েছি, পাঠকের প্রাত্যহিক শর্তবন্দী সত্তার উত্তরণ ঘটেছে শাশ্বত শুদ্ধসত্তায়। কবি যে জগৎ নির্মাণ করেছেন তাতে উৎকীর্ণ তার নিজস্ব জীবনবোধ ও স্বকীয় রচনাবৈশিষ্ট্য। একজন মহৎ সৃষ্টিশীল চারণ কবি তার স্বকীয়তা-চিহ্নিত ও নিজস্বতা-নির্দিষ্ট জগৎ-বৃত্তে কখনোই বন্দী হয়ে থাকেননি। তিনি বারবার স্বনির্মিত বৃত্তের পরিধি ছাড়িয়ে, ক্রমাগত নিজেকেই নিজে অতিক্রম করেছেন। নিরন্তর সৃষ্টি করে চলেছেন নিত্যনতুন জগৎবৃত্ত। আর এভাবেই ঘটতে থাকে তাঁর বৃত্ত থেকে বৃত্তান্তরে মহৎ সৃষ্টিশীল স্বাতিক্রমণ, লক্ষ্যাভিসারী অভিযাত্রা। তার প্রতিটি বৃত্তই পৃথক ও স্বয়ংসম্পুর্ণ, উজ্জ্বল ও অভিব্যক্তিময় এবং এক অন্তর্লীন সুত্রে পরস্পর গ্রথিত।

সামছুল হক মোল্লা তাঁর কবিতা, গানে গণমানুষের কথা বলেছেন। তাদের ব্যথা-বেদনা সহৃদয়তার সাথে তিনি অবলোকন করেছেন। তাঁর চাষী পিতার কষ্ট তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন গভীরভাবে। পিতার মৃত্যুর পর অভিভাবকহীন কবি জীবনের সকল ক্ষেত্রে অভাব-অনটন আর নিরাপত্তাহীনতাকে উপলব্ধি করেছেন হৃদয় দিয়ে। আর তাই দিনমজুরি থেকে অর্থনীতির জমিন যৌনতার খোলসে নারীর জিন্দা লাশ, হয়ে যাওয়ার চিরায়ত দুঃসংবাদ শুনেছেন বড়লোকের অন্তঃপুরের ক্ষমতার রাজনীতিতে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থান এবং বাণিজ্যে পরাজিত ভূলুণ্ঠিত বাঙালির হতাশা তার কবিতায় জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু অভাব বঞ্চনায় ছুঁয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাগুলো আরও বিস্তৃত জায়গা পেল না কেন, আরও মর্মঘাতি হলো না কেন তাঁর কবিতায় এ প্রশ্ন করেছিলাম কবিকে। উত্তর পেলাম, আমার সব কবিতা তুমি পড়তে পাওনি। দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, দুঃখ রয়ে গেল আমার সব কবিতা, ছাপার অক্ষর পেল না।

চারণ কবি সামছুল হক মোল্লা বলেছিলেন, কবি, লেখক দৃশ্যমান বাস্তবতার ভেতর সমান্তরাল আরেকটি বাস্তবতা, আরেকটি গল্প। সে গল্প কেউ শোনে না। আমার ভেতর ভিন্ন এক ভাবনা ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন কবি সামছুল হক মোল্লা। আমি ভেবেছিলাম, পুর্নপাঠে প্রতিবারই আমরা একটি ভিন্ন যাত্রাপথ আবিষ্কার করি কবিতার মানচিত্রে। চারণ কবির কবিতাগুলো এখন বহুস্বর ও বহুপ্রবাহী।

যে কোনো বিষয়কে কবির প্রকৃত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে জুড়ে দেয়াই হয়তো কবির সংগ্রাম। চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার জন্যে এ সংগ্রাম ছিলো অনেক কঠিন। কঠিন হলেও জীবনের এই বোঝাপড়াটাকে এড়িয়ে যেতে চাননি চারণ কবি। তার কবিতার কয়টি চরণ উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারলাম না, ''দেহ-পশারিণী বেচে পেটের জ্বালায় দেহ তার/ ঘটাও কেন অপমান

অমুল্যে রতন প্রতিভার/ গণ প্রেমই করবে তোমাদের মালিক গণ শিরোপার''/ তিনি তার অপর কবিতায় লিখেছেন, ''ব্রিটিশ দেখলাম, পাকও দেখলাম, দেখলাম বাংলাদেশ /আশায় আমার বছর বছর হইয়া গেলাম শেষ।/পেটের খাওন পিঠে দিল, পাওয়ার বেলায় জেলখানা /কিছু কইতে গেলে বানায় বোবা, খোদার ভয়ও মানছে না। ''

স্রোতে ভেসে যাওয়া খড়কুটোর মত সাধারণ মানুষের সামগ্রিক জীবনকে নিয়ে তার রচিত কবিতাগুলোতে জীবনের এক জটিল আবর্তময় রূপ ওঠে এসেছে। তার লেখা কবিতায় গণসঙ্গীতে তিনি ঘটনাগুলো ফুটিয়ে তুলেছেন এমন এক ভাষাশৈলীতে যা সাধারণ মানুষেরই ভাষা, যে কোনো সাধারণ মানুষের মনে হতে পারে, এটা তারই ভাষা, তারই কথা। এটাই অর্থাৎ এই ভাষাই তার বড় সৃষ্টি। চারণ কবি যখন বলেন, ''গর্ব আমার, স্বর্গ আমার জন্ম ভূমি বাংলাদেশ। প্রাণ থাকিতে কভু মোরা সইব না তার মলিন বেশ। মাতৃভূমি, দেশ, জননী বিশ্বমাঝে নিঃস্ব নয়।'' তার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ পড়ার পর চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার সৃষ্টির প্রতি কবিতা পিপাসু মানুষের আগ্রহ বেড়ে যায়। কবিতা সমুহ পাঠ করলে শুধু গ্রাম্য বা পল্লী বাংলার পাঠক নয়, নিসর্গপ্রেমী সংবেদনশীল নাগরিক মন খুঁজে পাবে পরমাত্মীয়ের সান্ত্বনা। সামছুল হক মোল্লার কবিতার আবেদন আমরা উপেক্ষা করবো কেমন করে? তাঁর শব্দ সোনা আমাদের দারুণ আকৃষ্ট করে। তার রচিত গণসঙ্গীতসমূহ যত শুনি, কান পেতে শোনার ইচ্ছা তীব্র হয় তত। বলতে ইচ্ছে করে, কবি তুমি উচ্চারণ করো মানুষের কথা, শুনবো বলে ''আমি কান পেতে রই''।

কবির ফরিয়াদ কবিতার একটি আহ্বান, ''ফরিয়াদ নয়, নয় প্রার্থনা, প্রয়োজন সংগ্রাম/ আর ভাবা নয়, সম্মুখে চল, কামিও না বদনাম। / প্রাণের দামেও সত্য বাঁচাও, দাও গোর মিথ্যার। / মরণরে ভয় করে নাই লাভ, মরণ হবেই হবে,/পশুর অধমজীবন ধারণে বাহাদুরি কিবা তবে/এসো মানুষেরা, দুনিয়াতে আনি মানুষেরি অধিকার।''

সমাজ-সংসারব্যাপী গণমানুষের নিত্যদিনের যে সংগ্রাম, যে আলোড়ন, বিলোড়ন, সেসবের কথা বলতে বলতে স্বভাব কবি সামছুল হক মোল্লা, খুব সচেতন নির্বিঘ্নতায় মানবিক আবেদনের কিছু ছাপ রেখে যান তার রচনায়। তিনি প্রশ্ন তুলে ধরেন, কিংবা তলে তলে বলেই ফেলেন অন্য কোনো কথা। যে কথা সাধারণ মানুষকে সকল প্রকার শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে সাহস জোগায়। কবির বাচনভঙ্গি, মুগ্ধকর অঙ্গভঙ্গি, বিশুদ্ধ উচ্চারণ যে কোনো মানুষকে প্রীত করতো। ১৯৭১ সনে রণাঙ্গনে যুদ্ধের ফাঁকে তার কাছেই শুনেছি গণচীনের মহান নেতা মাওসেতুং, চেগুয়েভরা, এম. এন. রায়ের গল্প। শোষকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠনের ইচ্ছে কবির উনসত্তরের গণআন্দোলনের পুর্বেই ছিলো। সামছুলক হক মোল্লা মাওলানা ভাসানীর সার্থক অনুসারী ছিলেন। শ্রমিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। সমাজ সচেতন কবি, শুধু কবিতা লিখেই ক্ষান্ত হননি, তিনি আপন বলয়ে শোষিত কৃষক শ্রেণীকে সংগঠিত করে, শোষকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করার প্রয়াস পেয়েছেন।

কবির একজন অনুরক্ত ভক্ত কাজী শাহাদাত লেখককে জানিয়েছেন, চারণকবির সাংবাদিক জীবনের অনুল্লেখিত বিষয়সমুহ। সাংবাদিকতায় ব্যাপৃত কবি ছিলেন একজন অকুতোভয় সাংবাদিক, তিনি 'সমাজকণ্ঠ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কিছু সময়। তার লেখা, অনেক সময় বিভিন্ন পত্রিকা রাজরোষের ভয়ে প্রকাশ করতে সাহস পেত না, কবি সেগুলো নিজ অর্থব্যয় করে ছাপিয়ে বিতরণ করতেন। কাজী শাহাদাত তার নিজের সাংবাদিক হয়ে ওঠার পেছনে চারণ কবির অবদানের কথা, সততার সাথে স্বীকার করেছেন। বাংলা ভাষার বিশুদ্ধতা ও রূপ নিয়ে কবি খুবই সচেতন ছিলেন। বাংলা ভাষার আদি উৎস সম্পর্কে অনেকের ধারণা, এটা পালিত বা সংস্কৃতি নির্ভর কবি এটা স্বীকার করতেন না। তিনি মনে করেন, বাংলা ভাষা প্রাচীন 'বং' ঘরানার উত্তম সংস্করণ বর্তমান বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষায় এখন অনেক বিজাতীয় বা ভিনদেশী ভাষায় সংমিশ্রণ আছে। এতকিছুর পরও বাংলা ভাষা তার ঐতিহ্য এ পর্যন্ত ধরে রেখেছে। চারণ কবি মনে করেন, কবি রবি ঠাকুরকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে প্রকারান্তরে বাংলা ভাষাকেই সম্মান করা হয়েছে। তিনি আরো মনে করেন, হালে বাংলা ভাষা তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে কিংবা অচিরেই ঐতিহ্য হারাবে।

আলাপ প্রসঙ্গে একদিন কাজী শাহাদাত আমাকে বলেছিলেন, চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার ব্যাপারে সুসাহিত্যিক অধ্যাপক হেলাল উদ্দিনের একটি বাক্য প্রণিধানযোগ্য, ''মুকুন্দ দাশের পর, বাংলার সাহিত্য আকাশে শুধু একজনই চারণ কবির খ্যাতি পেতে পারেন, তিনি হচ্ছেন সামছুল হক মোল্লা।''

প্রবন্ধটি শেষ করছি কবি বিরচিত ‘‘কর মুক্ত এ ধরাতল” কবিতার কয়টি লাইন উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে, ‘এসো সত্যের সৈনিক ঠিক, এসো মিথ্যার যমদুত। হাতিয়ার ধরো, নির্মূল করো দৈত্য-দানব সব ভূত।/ নয় দেরী আর, মুছাও এবার দু’খী মানুষের আঁখিজল /কর মুক্ত এ ধরাতল, কর মুক্ত এ ধরাতল।”

বিদায় বন্ধু, সহযোদ্ধা, চারণ কবি শামসুল হক মোল্লা। কামনা করি, তোমার বিদেহী আত্মার সদ্‌গতি হোক। কামনা করি, কোনো না কোনোদিন তোমার অপ্রকাশিত কবিতাসমূহ ছাপার অক্ষর পাবেই পাবে।

চাঁদপুরের অহংকার ও গৌরব চারণ কবি শামসুল হক মোল্লা পাশে কবি স্ত্রী সামছুন্নাহার বেগম